بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ ডিসেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ১৮ ফাতাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। মহানবী (সা.)-এর (জীবনের) অন্তিম অসুস্থতায় হযরত আলী (রা.) যে সেবা করেছেন, তার উল্লেখ বুখারীতে এভাবে রয়েছে যে, উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন– হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর রোগ বেড়ে যায় তখন তাঁর সেবা-শুশ্রূষা যাতে আমার ঘরে করা যায় এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের কাছ থেকে অনুমতি নেন। তারা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। তখন তিনি পা মাটিতে টেনে-হেঁচড়ে দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বের হন, আর তিনি (সা.) হযরত আব্বাস (রা.) এবং অন্য এক ব্যক্তির মাঝে ছিলেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) আয়েশা (রা.)'র গৃহেই ছিলেন আর সেখানে থেকেই তিনি মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে আসেন। হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি হযরত আব্বাস (রা.)'র কাছে সেকথার উল্লেখ করি যা হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন। তখন তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) যার নাম উল্লেখ করেছিলেন, তুমি কি জানো সে কে ছিল? আমি বললাম, না। হযরত আয়েশা (রা.) যে দুজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাদের একজন ছিলেন হযরত আব্বাস, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নাম উল্লেখ করেন নি তিনি ছিলেন হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে তাঁর সেই অসুস্থতার সময় বের হন যাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হে আবুল হাসান! আজ সকালে মহানবী (সা.)-এর শরীর কেমন? তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ আজ প্রভাতে তাঁর শরীর ভালো। তখন হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) হযরত আলী (রা.)'র হাত ধরে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনদিন পর তোমরা অন্য কারো অধীনস্ত হয়ে যাবে কেননা খোদার কসম! আমি দেখতে পাচ্ছি, মহানবী (সা.) তাঁর এই অসুস্থতায় অচিরেই ইন্তেকাল করবেন। কেননা মৃত্যুর সময় বনু আব্দুল মুত্তালিবের চেহারা (কেমন হয়) তা আমার খুব ভালো জানা আছে। আসো আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে যাই এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি, এ বিষয়টি অর্থাৎ খিলাফত কাদের মধ্য থেকে হবে? যদি আমাদের মধ্য থেকে হয় তাহলে আমরা জানতে পারবো আর আমারা ছাড়া অন্য কারো মধ্যে থেকে হলে তা-ও আমরা জানতে পারবো আর তিনি (সা.) আমাদেরকে এ সম্পর্কে নিশ্চয় কোন অসীয়্যত করে যাবেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যদি একথা মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করি আর তিনি যদি আমাদের এ সম্মান না দেন তাহলে তাঁর (মৃত্যুর) পর লোকেরাও আমাদেরকে সম্মান দিবে না। খোদার কসম! আমি মহানবী (সা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো না, এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত। বুখারীর এই জায়গায় আরবী শব্দগুলো হলো, أَنْتَ وَاللّٰهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا। এ সম্পর্কে হযরত সৈয়্যদ ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব তার পুস্তকে এই নোট লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এটি ইঙ্গিতসূচক বাক্য হিসাবে সেই ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর অন্য কারো অধীনস্ত হয়ে যাবে আর একথার অর্থ হল, তিনদিন পর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল

করবেন। হযরত আমের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে হযরত আলী, হযরত ফযল এবং হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.) গোসল দিয়েছেন এবং তারাই তাঁকে কবরে নামান। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, তারা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কেও নিজেদের সাথে নিয়েছেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করা সম্বন্ধে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়েতে আছে হযরত আলী (রা.) পূর্ণ আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তাৎক্ষণাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। কেউ কেউ আবার এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। যাহোক, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, মুহাজির ও আনসাররা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হাতে বয়আত করে ফেলেন, তখন হযরত আবু বকর মিম্বরে উঠে তাকিয়ে লোকেদের মাঝে কোথাও হযরত আলী (রা.)-কে দেখতে পেলেন না। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আনসারদের কয়েকজন গিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে আসেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলীকে সম্বোধন করে বললেন, হে মহানবী (সা.)-এর চাচাত ভাই ও তার জামাতা! তুমি কি মুসলমানদের শক্তিকে খর্ব করতে চাচ্ছ? হযরত আলী (রা.) বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)-এর খলীফা, আমাকে পাকড়াও করবেন না। এটি বলে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করে নেন। তাবারির ইতিহাসে উল্লেখ আছে, হাবীব বিন আবু সাবেত হতে বর্ণিত, হযরত আলী নিজ বাড়িতেই ছিলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, হযরত আবু বকর (রা.) বয়আত নেয়ার জন্য বসে আছেন। হযরত আলী লম্বা আলখেল্লা পরিহিত ছিলেন, বয়আত করতে দেরী হয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করে সে অবস্থাতেই তাড়াহুড়ো করে কোন পাজামা ও চাদর ছাড়াই বাইরে বেরিয়ে আসেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং তার নিকটে বসে যান। এরপর তিনি তার কাপড় আনিয়ে কাপড় পরিধান করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বৈঠকেই বসে থাকেন। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর প্রথম বা দ্বিতীয় দিনই তাঁর হাতে বয়আত করে নিয়েছিলেন আর এটাই সত্য। কেননা, হযরত আলী কখনো হযরত আবু বকরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি এবং তার ইমামতিতে নামায পড়াও পরিত্যাগ করেন নি।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত আলী সম্পর্কে বলেন, "হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু প্রথমদিকে হযরত আবু বকরের হাতে বয়াতের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে আল্লাহ্ মালুম, হঠাৎ কি মনে হল! পাগড়িও বাঁধেন নি আর টুপি পরেই দ্রুত বয়াতের জন্য চলে আসেন আর এরপর পাগড়ি আনিয়ে নেন। মনে হয়, তার হৃদয়ে এ ধারণার উদ্রেক হয়ে থাকবে যে, এটি তো অনেক বড় পাপ। এ কারণে এত তাড়াহুড়ো করেন আর পাগড়িও বাঁধেন নি" অর্থাৎ পুরো কাপড়ও পরিধান করেন নি এবং (বয়াতের জন্য) ছুটে আসেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী হযরত ফাতেমার মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়াত করেছিলেন। যেমনটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী হযরত ফাতেমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বয়াত করেন নি। তবে, অনেক আলেম বুখারীতে বিদ্যমান এ রেওয়ায়েতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন বা প্রশ্ন উঠিয়েছেন। যেমন, ইমাম বায়হাকী 'সুনানুল কুবরা'তে ইমাম শাহাবুদ্দিন যুহরীর উক্তি, 'হযরত আলী হযরত ফাতেমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত করেন নি'– সম্পর্কে যা লিখেছেন এর অনুবাদ হল, হযরত আলী হযরত ফাতেমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত হতে বিরত ছিলেন- ইমাম যুহরীর এ উক্তিটি একটি মুনকাতে' হাদীস (যার

সনদের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে নি)। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতটি বেশি সঠিক যাতে এ কথার উল্লেখ আছে যে, হযরত আলী সাকিফার পরে অনুষ্ঠিত গণ বয়াতের সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন।

কতিপয় আলেম বুখারীতে উল্লিখিত এ রেওয়ায়েতের সমন্বয় করতে গিয়ে এই দ্বিতীয় বয়আতকে তারা বয়আত নবায়ন নাম দিয়েছেন। আলেমরা হয়ত ভেবেছেন যে, বুখারীর মত গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতটির বিদ্যমানতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কোন কিছু অবশ্যই ঘটে থাকবে, যে কারণে হযরত আলীর দ্বিতীয় বয়াতের কোন নাম রাখা হয়েছে। কিন্তু বুখারীর সকল রেওয়ায়েত সঠিক হবে –তা আবশ্যক নয়। যেমন, ডক্টর আলী মুহাম্মদ সালাবী তার 'সীরাতু আমীরিল মু'মেনীন আলী বিন আবী তালেব শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু' পুস্তকে লেখেন, আল্লামা ইবনে কাসীর এবং আরো অনেক বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতে হযরত আলী হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ইন্তেকালের ছয় মাস পর বয়াআত নবায়ন করেছেন। তারা এই বয়আতের নাম রেখে দিয়েছেন 'বয়াত নবায়ন', অর্থাৎ প্রথমেও বয়াআত করেছিলেন, পুনরায় হযরত ফাতেমা (রা.)-এর মৃত্যুর পর বয়আতের নবায়ন করেন। আল্লামা ইবনে কাসীর লেখেন, হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে নিজের বয়আতের নবায়ন করা সমীচীন বলে মনে করেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আরবী পুস্তক সির্‌রুল খিলাফায় যা বলেন, এর অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে। যারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে আর মনে করে যে, আসলে সেসময় হযরত আলীরই খলীফা হওয়া উচিত ছিল- এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমরা যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নিই, হযরত সিদ্দীকে আকবর এমন লোকদের অন্তভুক্ত ছিলেন- যারা দুনিয়া এবং এর আকর্ষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এর আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং আত্মসাৎকারী ছিলেন; তাহলে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে একথাও স্বীকার করতে হবে, খোদার সিংহ হযরত আলীও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্। আর আমরা তাঁকে যেমন দুনিয়া-বিমুখ খোদানুরাগী মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তিনি তেমন ছিলেন না, বরং তিনিও দুনিয়া ও এর মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন অধিকন্তু এর চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এ কারণেই কাফের ও মুরতাদদের সাথে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি (অর্থাৎ হযরত আবু বকরকে কাফের বলা হয় এবং খুব কঠিন ভাষা ব্যবহার করা হতো) বরং চাটুকারদের ন্যায় তাদের দলভুক্ত থাকেন। প্রায় ত্রিশ বছর তিনি 'তাকিয়া'র মাঝে কাটিয়েছেন । প্রশ্ন হলো, আলী মুর্তজার চোখে যখন হযরত সিদ্দীকে আকবর কাফের ও আত্মসাৎকারীই ছিলেন, কেন তিনি স্বানন্দে তার বয়াআত করতে সম্মত হলেন? তিনি কেন নৈরাজ্য এবং মুরতাদদের দেশ ত্যাগ করে অন্য কোন দেশে হিজরত করলেন না? আল্লাহর ভূমি কি এতটা বিস্তৃত ছিল না যে, মুত্তাকীদের রীতি অনুসারে তিনি সেখানে হিজরত করে চলে যেতেন? বিশ্বস্ত ইব্রাহীমের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, সত্যের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কত বলিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন! তিনি যখন দেখলেন, তাঁর পিতা পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং জাতি মহাসম্মানিত ও পরাক্রমশালী প্রভুকে পরিত্যাগ করে প্রতিমাপূজায় মগ্ন, তখন তিনি ভীত না হয়ে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, দুষ্কৃতকারীদের ভয়ে 'তাকিয়া' অবলম্বন করেন নি। এটিই পুণ্যবানদের আদর্শ, তাঁরা তরবারি বা বর্শাকে ভয় করেন না। তারা তাকিয়াকে সবচেয়ে বড় পাপ, অশ্লীল কাজ ও সীমালঙ্ঘন বলে মনে করেন। কোন কারণে এমন হীন কাজ যদি বিন্দুমাত্রও তাদের দ্বারা ঘটেও যায় তাহলে তারা ইস্তেগফার করতঃ আল্লাহর প্রতি বিনত হন বা প্রত্যাবর্তন করেন।

আমরা বিস্মিত হই! হযরত আলী (রা.) জানতেন, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর ফারুক কুফরী করেছেন এবং অধিকার খর্ব করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি কীভাবে তাদের হাতে বয়আত করলেন? তাদের নৈরাজ্য, কুফর ও ধর্মত্যাগ সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের উভয়ের সাহচর্যে দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে তাদের আনুগত্য করছেন, কখনো কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নি, কোন ঘৃণা প্রদর্শন করে নি, অন্য কোন বিষয়ও তার আন্তরিকতায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় নি এবং তার ঈমানী খোদাভীতিও তাকে একাজ থেকে বিরত রাখে নি। এছাড়া তার এবং আরব জাতিগুলোর মাঝে মেলামেশার বা যোগাযোগের দ্বার রুদ্ধ ছিল না, দীর্ঘ কোন অন্তরায়ও ছিল না আর তিনি কারারুদ্ধও ছিলেন না। এরূপ পরিস্থিতে তার জন্য আবশ্যক ছিল কোন আরব অঞ্চলে বা পূর্ব কিংবা পশ্চিমের কোন অঞ্চলে হিজরত করা। পরিস্থিতি এমনই হয়ে থাকলে অর্থাৎ কোনরূপ জবরদস্তি করা হয়ে থাকলে তিনি হিজরত করতে পারতেন এবং মানুষকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তার কেবল হিজরত করাই উচিত ছিল না বরং লোকদেরকে যুদ্ধের জন্যও উদ্বুদ্ধ করাও উচিত ছিল। কেননা তারা মুর্তাদ বা ধর্মত্যাগীও কাফের, তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এছাড়া বেদুঈন বা মরুবাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বীয় বাগ্মিতাপূর্ণ প্রাঞ্জল বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে নিজের পছন্দের কাজে নিয়োজিত করা আর মুরতাদ গোষ্ঠির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত ছিল।

তিনি (আ.) বলেন, মুসায়লামা কাযযাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ মরুবাসী সমবেত হয়েছিল, অথচ হযরত আলী (রা.)-এ সাহায্য করার বেশি অধিকার রাখতেন এবং তিনিই এ অভিযানকে সফল করার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, তিনি কেন কাফেরদের অনুসরণ করলেন? অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলীফাগণের তিনি কেন অনুসরণ করলেন যাদেরকে তোমরা কাফের আখ্যা দিয়ে থাকো। তিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অলসদের মত বসে রইলেন আর মুজাহিদের ন্যায় কেন দণ্ডায়মান হলেন না! সফলতা ও উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কী তাঁকে এই অভিযানে বের হতে বারণ করেছিল? তিনি কেন যুদ্ধবিগ্রহ, সত্যের সমর্থন এবং লোকদেরকে আহ্বানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন না? তিনি কি জাতির মাঝে সবচেয়ে বাগ্মী বক্তা ও সেসব লোকের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না যারা বক্তিতার মাধ্যমে জীবিত করতে পারে? স্বীয় বাগ্মিতা ও উন্নত বক্তৃতার বলে আর শ্রোতামণ্ডলির ওপর প্রভাব বিস্তারের গুণে মানুষকে নিজের কাছে একত্র করা তাঁর জন্য কেবল এক ঘন্টা বরং এর চেয়েও কম সময়ের ব্যপার ছিল। মানুষ যখন এক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের চতুর্পার্শ্বে সমবেত হলো তখন খোদার সিংহের কর্মকাণ্ড ভিন্ন কিছু হওয়া উচিত ছিল, যিনি মহান ক্ষমতাবান প্রভুর সাহায্যপুষ্ট এবং বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর প্রিয়ভাজন ছিলেন? সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা আর সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, তিনি শুধু বয়আত করেই ক্ষান্ত হন নি অর্থাৎ তিনি শুধু বয়আতই করেন নি বরং সব নামায হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর পিছনে পড়েছেন। এক বেলাও পিছিয়ে থাকেন নি আর আপত্তিকারীদের ন্যায় তাদেরকে এড়িয়েও চলেন নি। তিনি তাদের পরামর্শ সভায় বসেছেন, তাদের দাবির সত্যায়ন করেছেন এবং নিজ পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছেন আর কখনোই পিছপা হন নি। কাজেই গভীরভাবে প্রণিধান কর এবং বল! এগুলোই কি নিপীড়িত ও কাফের আখ্যাদাতা লোকদের লক্ষণ? এছাড়া এ বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশ কর! মিথ্যাকথন ও প্রতারণা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তিনি অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) তাদের এমনভাবে অনুসরণ করেন যেন তার দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই? তিনি কি জানতেন না, যারা সর্বশক্তিমান খোদার ওপর নির্ভর করে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের জন্য পুড়িয়ে ফেলা কিংবা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া অথবা টুকরো-টুকরো করে ফেলা হলেও তারা এক মুহূর্তের জন্যও চাটুকারিতা অবলম্বন করে না।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, হযরত আলী (রা.) কখনো তাঁর পূর্ববর্তী খলীফাগণের বিরোধিতা করেন নি বরং তাঁদের বয়আত করেছেন। হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত করেন নি– মর্মে তোমরা যা কিছু বলে থাক, এ কথা তো হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না বরং ক্ষুণ্ন করে। তিন খলীফার যুগেই হযরত আলী (রা.) কোন্ কোন্ সেবামূলক অবদান রেখেছেন? মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আরবের অনেক গোত্র মুর্তাদ হয়ে যায় এবং মদীনাতেও মুনাফেকরা মাথাচাড়া দেয়। বনু হানিফা ও ইয়ামামার অধিকাংশ লোক মুসায়লামা কায্যাবের দলে যোগ দেয়। অপর দিকে বনু আসাদ, ত্যায় এবং অন্যান্য গোত্রের অনেক লোক তুলায়হা আসাদীর সাথে সমবেত হয়। সেও মুসায়লামার ন্যায় নবুয়্যতের দাবি করে বসেছিল। বিপদ-আপদ অনেক বেড়ে যায় আর পরিস্থিতি চরমভাবে বিকৃতির স্বীকার হয়। এ অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন তখন তাঁর কাছে কেবল অল্প সংখ্যক মানুষ রয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে অনেক বেদুইনের মনে মদীনা দখলের সাধ জাগে আর তারা মদীনায় আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র আঁটে। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মদিনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে এবং মদিনার আশপাশে পাহারাদার নিযুক্ত করেন, যারা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাহারারত অবস্থায় রাত অতিবাহিত করত।

এসব প্রহরাদারের তত্ত্বাবধায়কদের মাঝে ছিলেন হযরত আলী বিন আবু তালেব, যুবায়ের বিন আওয়াম, তালহা বিন আব্দুল্লাহ্, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, আব্দুর রহমান বিন আওফ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)। অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) তখনো সেনাবাহিনীর একটি অংশের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যারা নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ জনসাধারনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখন আরবের অধিকাংশ গোত্র মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় এবং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মুহাজের ও আনসারদের সাথে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। যখন নজদের উচ্চভূমির বিপরীত দিকের একটি পুকুরের কাছে পৌঁছেন তখন বিদুঈনরা সেখান থেকে তাদের পরিবারপরিজন নিয়ে পলায়ন করে। প্রকৃত বিষয় হল, একদিকে তাদের মুসলমান হওয়ারও দাবি ছিল আর পুরোপুরি মুরতাদও ছিল না কিন্তু অপরদিকে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, এজন্য যুদ্ধ করা হয়েছিল। মুরতাদ হওয়ার কারণে তারা শাস্তি পাচ্ছিল– এমনটি নয়। তারা যখন পালিয়ে যায় তখন লোকেরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে নিবেদন করে, নিজ স্ত্রী-সন্তানদের কাছে মদিনায় ফিরে চলুন আর কাউকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে দিন। মানুষের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, তারা যদি মুসলমান হয় বা বয়াত করে নেয় এবং যাকাত প্রদান করে, তখন তোমাদের মধ্যে যারা ফিরে আসতে চায় তারা ফিরে আসতে পারবে। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মদিনায় ফিরে আসেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, হযরত উমর (রা.) নিজ খেলাফতকালে কতক সফরের সময় হযরত আলী (রা.)কে নিজের স্থলে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

যেমন তবারীর ইতিহাস গ্রন্থে লেখা রয়েছে জিসরের ঘটনার সময় পারস্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যে এক ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়; তখন হযরত উমর (রা.) লোকদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি স্বয়ং ইসলামী সেনাদলের সাথে ইরান সীমান্তে উপস্থিত হবেন। সে সময় তিনি নিজের স্থলে হযরত আলীকে (রা.) মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, জিসরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সবচেয়ে

বড় এবং ভয়ংকর পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইরানিদের সাথে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী যায়। ইরানি সেনাপতি নদীর অপরপারে নিজের সেনাবুহ্য গড়ে তোলে আর মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করে। ইসলামী সেনাবাহিনী উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে যায় আর তাদের ওপর হামলা করে এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে যায়। কিন্তু এটি আসলে ইরানি কমান্ডারের একটি রণকৌশল ছিল। সে একটি সেনাদলকে পার্শ্বদেশ অর্থাৎ এক পাশ থেকে পাঠিয়ে সেতুর ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে এবং নতুন উদ্যমে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা কৌশলগত কারণে পিছিয়ে যায় কিন্তু তারা দেখে শত্রুপক্ষ সেতু দখল করে রেখেছে। ভীত হয়ে অন্য দিকে গেলে শত্রুরা (তাদের ওপর) তীব্র আক্রমণ হানে, ফলে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয় এবং মৃত্যুও বরণ করে। মুসলমানদের এ ক্ষতি এতই ভয়ংকর ছিল যে, মদীনাও এতে কেঁপে উঠে। হযরত উমর (রা.) মদীনাবাসীদের একত্রিত করে বলেন, এখন মদীনা এবং ইরানের মাঝে আর কোন প্রতিবন্ধক নেই। মদীনা একেবারে অরক্ষিত হয়ে গেছে। হতে পারে কয়েকদিনের মধ্যেই শত্রুরা এখানে পৌঁছে যাবে। এজন্য আমি স্বয়ং কমান্ডার হিসেবে যেতে চাচ্ছি। অন্য লোকেরা এ প্রস্তাবটি পছন্দ করলেও হযরত আলী (রা.) বলেন, খোদা না করুন! আপনি যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে আর তাদের একতা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য অন্য কাউকে পাঠানো উচিত, আপনি স্বয়ং যাবেন না। এতে হযরত উমর (রা.) সিরিয়ায় রোমানদের সাথে যুদ্ধরত হযরত সা'দ (রা.) কে পত্র লিখেন, তুমি যত সংখ্যক সৈন্য পাঠাতে পার পাঠিয়ে দাও, কেননা মদীনা এখন একেবারেই অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। তাই শত্রুদের যদি এখনই থামানো না হয় তাহলে তারা মদীনা দখল করে নিবে।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ফিতনা ও নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিলে সেটিকে প্রতিহত করার জন্য হযরত আলী (রা.) তাঁকে নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। একবার হযরত উসমান (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, দেশব্যাপী বিরাজমান বিশৃংখলা ও দাঙ্গারহাঙ্গামার মূল হেতু কী আর তা নিরসনের উপায় কী? হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণভাবে এবং নিঃসঙ্কোচে বলেন, বর্তমান অস্থিরতার সবটাই আপনার কর্মকর্তাদের ভারসাম্যহীনতারই ফল। হযরত উসমান (রা.) বলেন, কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমিও তো সেসব বৈশিষ্ট্যই দৃষ্টিপটে রেখেছি- যেগুলো হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে ছিল, তথাপি তাদের প্রতি গণ-অসন্তোষের কারণ বুঝতে পারছি না। হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যা এটি সত্য, কিন্তু হযরত উমর (রা.) সবার লাগাম নিজের হাতে রেখেছিলেন আর তার নিয়ন্ত্রন এত কঠোর ছিল যে, আরবের সবচেয়ে অবাধ্য উটও ছটফট করে উঠতো। অত্যন্ত কঠোর হস্তে নিগরানি করতেন। পক্ষান্তরে আপনি অপ্রয়োজনীয়মাত্রায় নমনীয়। আপনার কর্মকর্তারা আপনার এই নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে যাচ্ছেতাই করে আর আপনি এর খবরও পান না। প্রজারা মনে করে, কর্মকর্তারা যা কিছু করছে, এর সবই খিলাফতের দরবার থেকে প্রাপ্ত নির্দেশের অধীনেই করছে। এভাবে সমস্ত ভারসাম্যহীনতার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতে হয় আপনাকে। যখন মিশরিয়রা হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি অবরোধ করে আর অবরোধে এতটা কঠোরতা অবলম্বন করে যে, খাদ্যপানীয়ের সরবরাহও বন্ধ করে দেয়, তখন হযরত আলী (রা.) জানতে পেরে অবরোধকারীদের কাছে যান এবং বলেন, তোমরা যে ধরণের অবরোধ দাঁড় করিয়েছ তা কেবল ইসলাম বিরোধীই নয় বরং মানবতাবিরোধীও বটে। কাফেররাও মুসলমানদের বন্দী করলে পানাহার থেকে বঞ্চিত রাখে না। হযরত উসমান (রা.) সম্বন্ধে হযরত আলী (রা.) বলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের কী ক্ষতি করেছেন যে, তোমরা (তাঁর সাথে) এমন কঠোর আচরণ করছ। অবরোধকারীরা হযরত আলী (রা.)-এর সুপারিশের কোন তোয়াক্কাই করে নি এবং অবরোধে ছাড় দিতে পুরোপুরি অস্বীকৃতি জানায়। হযরত আলী (রা.) রাগ করে তাঁর মাথার পাগড়ি ছুড়ে

ফেলে দিয়ে চলে যান। লোকেরা হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি অবরোধ করে, পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) উপর থেকে উঁকি মেরে দেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মাঝে কি আলী আছে? লোকেরা বলে, না। পুনরায় তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, সা'দ আছে? জবাব আসে, না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হযরত উসমান (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে আলীকে গিয়ে আমাদেরকে পানি পান করাতে বলবে। একথা অবগত হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) পানি ভর্তি ৩টি মশক হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন কিন্তু বিদ্রোহীদের বাধার মুখে এই মশকগুলো হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল না, সেগুলো নিয়ে যেতে দিচ্ছিল না। এই মশকগুলো পৌঁছাতে গিয়ে বনু হাশেম ও বনু উমাইয়া গোত্রের বেশ কয়েকজন কৃতদাস আহত হয়। পরিশেষে সেই পানি হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে পৌঁছে। হযরত আলী (রা.) যখন জানতে পারেন হযরত উসমান (রা.)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, তখন তিনি তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইনকে বলেন, নিজ নিজ তরবারি নিয়ে যাও এবং হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ির সদর দরজায় দাড়িয়ে যাও। সাবধান! কোন দাঙ্গাবাজ যেন তাঁর (রা.) কাছেও ভিড়তে না পারে।

এটি দেখে বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ির দরজা লক্ষ্য করে তির ছুড়তে আরম্ভ করে যার ফলে হযরত হাসান (রা.) এবং হযরত মুহাম্মদ বিন তালহা (রা.) রক্তে রঞ্জিত হয়ে যান। ইতোমধ্যে দুজন সঙ্গীসহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর সন্তর্পণে এক (প্রতিবেশীর) আনসারীর বাড়ির দিক থেকে টপকে হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাঁকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ পাওয়ার পর হযরত আলী (রা.) ঘটনাস্থলে এসে দেখেন, হযরত উসমান (রা.)কে সত্যিই শহীদ করা হয়েছে। তখন তিনি (রা.) তাঁর দুই পুত্রকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের দু'জনের প্রহরা থাকা সত্ত্বেও হযরত উসমান (রা.)কে কীভাবে শহীদ করা হলো? একথা বলে তিনি (রা.) হযরত হাসান (রা.)কে চপেটাঘাত করেন এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর বুকে ধাক্কা মারেন আর মুহাম্মদ বিন তালহা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)কে ভর্ৎসনা করে রাগান্বিত অবস্থায় সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসেন।

শাদ্দাদ বিন অওস বর্ণনা করেন যে, ইয়ামুদ্বার-এ অর্থাৎ যেদিন বিদ্রোহীরা হযরত উসমানকে তাঁর ঘরে অবরুদ্ধ করে অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ করেছিল, হযরত উসমান এর অবরোধ যখন চরম রূপ ধারণ করে। তখন হযরত উসমান উঁকি দিয়ে মানুষকে দেখেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখলাম হযরত আলী নিজের ঘর থেকে বাহিরে বের হচ্ছিলেন আর তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর পাগড়ি পরিহিত ছিলেন এবং নিজের তরবারি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সম্মুখে মুহাজের ও আনসারদের জামা'ত ছিল, যাদের মাঝে হযরত হাসান এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরও ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। অতঃপর তারা হযরত উসমানের গৃহে প্রবেশ করেন আর হযরত আলী নিবেদন করেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। মহানবী (সা.)-এর ধর্মের উন্নতি ও দৃঢ়তা তখন লাভ হয়েছে যখন তিনি (স্বীয়) মান্যকারীদের সাথে নিয়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। খোদার কসম, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এরা আপনাকে অবশ্যই হত্যা করবে। অতএব আপনি আমাদেরকে তাদের সাথে লড়াই করার অনুমতি প্রদান করুন। উত্তরে হযরত উসমান বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তা'লাকে সত্য মানে এবং স্বীকার করে যে, তার ওপর আমার অধিকার রয়েছে, আমি তাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, সে যেন আমার খাতিরে কারো বিন্দু পরিমাণ রক্তও না ঝরায় এবং আমার খাতিরে নিজের রক্তও যেন প্রবাহিত না করে। হযরত আলী পুনরায় একই অনুরোধ জানালে হযরত উসমান পুনরায় একই উত্তর

প্রদান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি হযরত আলীকে হযরত উসমানের গৃহ থেকে বের হয়ে যেতে দেখি। তিনি তখন বলছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি জান যে, আমরা পুরো চেষ্টা করেছি। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে আসেন। তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তাকে বলে, হে আবুল হাসান! আগে যান এবং মানুষকে নামায পড়ান। হযরত আলী বলেন, আমি তোমাদের নামায পড়াতে পারব না যখনকিনা ইমাম অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। আমি একা নামায পড়ে নিব। এরপর তিনি একা নামায পড়ে ফিরে যান। হযরত আলীর পুত্র আসেন এবং তাকে বলেন, হে আমার পিতা! খোদার কসম, বিরোধীরা হযরত উসমানের গৃহে আক্রমণ করেছে। হযরত আলী বলেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ খোদার কসম, তারা তাকে হত্যা করবে। মানুষ হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করে, হযরত উসমান কোথায় থাকবেন? অর্থাৎ শাহাদাতের পর (কোথায় থাকবেন)। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কসম, জান্নাতে (থাকবেন)। মানুষ জিজ্ঞেস করে, হে আবুল হাসান আর যারা হত্যা করেছে তারা কোথায় থাকবে? হযরত আলী বলেন, খোদার কসম, আগুনে (থাকবে)। তিনি এই কথা তিনবার বলেন।

বিদ্রোহীরা যখন মদিনা অবরোধ করেছিল, সেই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মিশরবাসীরা হযরত আলীর কাছে যায়। তিনি তখন মদিনার বাহিরে সেনাবাহিনীর একটি অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং তাদের (অর্থাৎ বিদ্রোহীদের) দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তারা তাঁর কাছে পৌঁছে নিবেদন করে যে, হযরত উসমানের (রা.) অব্যবস্থাপনার কারণে এখন তিনি খিলাফতের যোগ্য নন। আমরা তাকে পৃথক করার জন্য এসেছি, আর আশা করি যে, তাঁর পর আপনি এই পদ গ্রহণ করবেন। হযরত আলী (রা.) উক্ত মুনাফেকদের কথা শুনে সেই ধর্মীয় আত্মাভিমানের বসবর্তী হয়ে, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন যা তার মর্যাদার লোকের পক্ষে যথোচিত ছিল, আর অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন এবং বলেন, সকল পুণ্যবান ব্যক্তি জানে যে, মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে যুল-মারওয়া ও যু-খুশব নামক স্থানে তাবু স্থাপনকারী বাহিনীসমূহের উল্লেখ করে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছিলেন; এটি সেই যায়গা যেখানে মিশরীয়রা ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। অতএব খোদা তা'লা তোমাদের অমঙ্গল করুন, তোমরা ফিরে যাও। এতে তারা বলে, বেশ ভালো, আমরা ফিরে যাচ্ছি। এই কথা বলে তারা ফিরে যায়।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত এবং এরপর খলীফা হিসেবে হযরত আলীর হাতে বয়আত গ্রহণ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তা ইতিপূর্বেও কোন প্রসঙ্গে একবার আমি উল্লেখ করেছি। পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলাম, এখন এখানে ঘটনা সংক্ষেপে আবার তুলে ধরছি। হযরত উসমান (রা.) যখন শহীদ হন, তখন সবাই হযরত আলীর কাছে ছুটে আসে, যাদের মাঝে সাহাবীরাও ছিলেন এবং অন্যান্যরাও ছিল। তারা সবাই একথাই বলছিলো যে, আলী হলেন আমীরুল মুমিনীন; তারা তার (রা.) বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমরা আপনার বয়আত করছি, আপনি আপনার হাত এগিয়ে দিন, কেননা আপনিই এই দায়িত্বের জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য। একথা শুনে হযরত আলী বলেন, এটি তোমাদের কাজ নয়, এটি বদরী সাহাবীদের কাজ। তাই বদরী সাহাবীগণ যার পক্ষে মত দিবেন, তিনি-ই খলীফা হবেন। একথা শুনে সবাই হযরত আলীর সমীপে উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে, আমরা আর কাউকে আপনার চেয়ে অধিক এই পদের যোগ্য মনে করি না। তাই আপনি আপনার হাত এগিয়ে দিন যেন আমরা আপনার বয়আত গ্রহণ করতে পারি। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তালহা ও যুবায়ের কোথায়? এরপর হযরত তালহা সর্বপ্রথম কাছে এসে মৌখিকভাবে বয়আত করেন এবং হযরত সা'দ সর্বপ্রথম তাঁর হাতে হাত রেখে বয়আত করেন। হযরত আলী এই অবস্থা দেখে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং মিম্বরে চড়েন। হযরত তালহা প্রথম ব্যক্তি ছিলেন

যিনি হযরত আলীর কাছে গিয়ে মিম্বরে চড়েন এবং তাঁর কাছে বয়আত করেন; তারপর হযরত যুবায়ের বয়আত গ্রহণ করেন এবং এরপর অবশিষ্ট সাহাবীগণ। হযরত উসমানের শাহাদাতোত্তর ঘটনাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ-

হযরত উসমানকে যখন শহীদ করা হয় তখন নৈরাজ্যবাদীরা বায়তুলমাল লুটপাট করে এবং ঘোষণা দেয় যে, যে প্রতিরোধ গড়তে চাইবে, তাকে হত্যা করা হবে। মানুষজনকে সমবেত হতে দেয়া হতো না। কেউ একত্রিত হতে পারত না; এখন যেভাবে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, তেমন পরিস্থিতি ছিল । মদিনাকে তারা কঠোরভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল এবং কাউকে বাহিরে যেতে দেয়া হতো না। কিংবা বলা যায়, যেভাবে কারফিউ দেয়া হয়, তেমন পরিস্থিতি ছিল। এমনকি, যে হযরত আলীর প্রতি তারা ভালোবাসার দাবি করতো, তাকেও আটকে দেয়া হয়েছিল এবং মদিনায় মারাত্মক লুটপাট চালানো হয়। একদিকে ছিল এই অবস্থা আর অপরদিকে তারা এতটাই পাষণ্ডতার পরিচয় দিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সেই পবিত্র ব্যক্তি হযরত উসমানকে কেবল হত্যা করে ক্ষান্ত হয় নি বরং তাঁর মরদেহ তিন-চারদিন পর্যন্ত দাফন করতে দেয় নি। অবশেষে কয়েকজন সাহাবী মিলে রাতের আধারে গোপনে তাকে দাফন করেন। হযরত উসমানের সাথে কয়েকজন ক্রীতদাসও শহীদ হয়েছিলেন; তাদের মরদেহও দাফন করতে তারা বাধা দেয় এবং কুকুরের সামনে তাদের ছুঁড়ে দেয়। হযরত উসমান এবং ক্রীতদাসদের সাথে এই দুর্ব্যবহার করার পর নৈরাজ্যবাদীরা মদিনার অধিবাসীদের ছেড়ে দেয়, যাদের সাথে তাদের কোন শত্রুতা ছিল না; আর সাহাবীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। পাঁচটি দিন এমন অবস্থায় কেটে যায় যে, মদীনার কোন শাসক ছিল না মদীনায় শাসক বিহীন অবস্থায় পাঁচটি দিন কেটে যায়। নৈরাজ্যবাদীরা নিজেদের পক্ষ থেকে কাউকে খলীফা বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, যেন তাকে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সাহাবীদের কেউ-ই এটি সহ্য করেন নি যে, তারা সেসব মানুষের খলীফা হবেন যারা হযরত উসমানকে হত্যা করেছে। নৈরাজ্যবাদীরা পালাক্রমে হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরের কাছে বারবার যায় আর তাদেরকে খলীফা হতে বলে, কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃতি জানান। তাঁরা যখন অস্বীকৃতি জানান এবং মুসলমানরা তাঁদের বর্তমানে অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতে পারতো না, তখন নৈরাজ্যবাদীরা তাঁদের ক্ষেত্রেও জবরদস্তি আরম্ভ করে। কেননা তারা ভাবে, যদি কেউ খলীফা না হয়, তাহলে পুরো মুসলিম বিশ্বে আমাদের বিরুদ্ধে এক তুফান সৃষ্টি হবে। তারা ঘোষণা দেয় যে, দু'দিনের ভেতর যদি কাউকে খলীফা বানানো হয় তাহলে ভালো, নতুবা আমরা আলী, তালহা ও যুবায়ের এবং অন্যসব শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের হত্যা করব। এ কথায় মদিনাবাসীদের মাঝে শঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, হযরত উসমানকে যারা হত্যা করেছে, তারা আমাদের এবং আমাদের নারী ও শিশুদের সাথে না জানি কী করবে? তারা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে যায় এবং তাকে খলীফা হওয়ার জন্য বলে, কিন্তু তিনি (রা.) অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমি যদি খলীফা হই তাহলে সবাই এটিই বলবে যে, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করিয়েছি আর এই বোঝা আমি বহন করতে পারব না। একই কথা হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন আর অন্য যাদেরকে খলীফা হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল সেই সাহাবীগণও (খলিফা হতে) অস্বীকৃতি জানান। পরিশেষে সবাই মিলে পুনরায় হযরত আলী (রা.)-এর কাছে যায় এবং বলে, যেভাবেই হোক আপনি এ ভার কাঁধে নিন। অবশেষে তিনি (রা.) বলেন, আমি কেবল এ শর্তেই এমন গুরুভার বহন করতে পারি যদি সবাই মসজিদে একত্রিত হয় এবং আমাকে গ্রহণ করে নেয়। অতএব সবাই মসজিদে একত্রিত হয় এবং তাকে (রা.) গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু কতক এটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর

হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়া না হবে ততক্ষণ আমরা কাউকে খলীফা হিসেবে মানব না। আবার কেউ কেউ বলে, বাহিরের মুসলমানদের মতামত না জানা পর্যন্ত কারো খলীফা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। এভাবে হযরত আলী (রা.) যদিও খলীফা হওয়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু ফলাফল তাই সামনে আসে যার তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। পুরো ইসলামী বিশ্ব এ কথা বলতে আরম্ভ করে যে, হযরত আলী হযরত উসমানকে হত্যা করিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর অন্যসব গুণাবলীকে উপেক্ষা করা হলেও আমার দৃষ্টিতে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাঁর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা এমন সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা একান্ত প্রশংসাযোগ্য, কেননা ইসলামের স্বার্থে তিনি (রা.) নিজের মান-সম্মান এবং নিজসত্তার কোন পরোয়া করেন নি এবং এত বড় বোঝা নিজের কাধে উঠিয়ে নেন।

অতঃপর হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত-পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে অন্যত্র হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দু-একদিন অনেক লুটপাট চলতে থাকে, কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত হলে সেই বিদ্রোহীরা নিজেদের পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত হয় এবং ভয় পায় যে, এখন কী হবে? অতএব কেউ কেউ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে এটি ভেবে যে, হযরত মুআবিয়া (রা.) একজন শক্তিশালী মানুষ আর তিনি অবশ্যই এই হত্যার প্রতিশোধ নিবেন, এবং সেখানে পৌঁছে নিজেরাই হাহুতাশ আরম্ভ করে দেয় যে, হযরত উসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন আর কেউ তার প্রতিশোধ নিচ্ছে না। তাদের কেউ কেউ পালিয়ে মক্কার পথে হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে মিলিত হয় আর বলে, এটা কত বড় অবিচার যে, ইসলামের খলীফাকে শহীদ করা হবে অথচ মুসলমানরা নীরব বসে আছে! কতক পালিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পৌঁছে এবং বলে, এটি বিপদের সময়। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আপনি বয়আত গ্রহণ করুন যাতে মানুষের ভয় দূরীভূত হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হয়। মদিনায় উপস্থিত সাহাবীগণও সর্বসম্মতভাবে এই পরামর্শই প্রদান করেন যে, এই মুহূর্তে এটিই সমীচীন হবে যে, এই গুরুভার আপনি নিজের কাঁধে রাখুন, কেননা আপনার এ কাজ পুণ্য এবং খোদার সন্তুষ্টির কারণ হবে। চতুর্দিক থেকে যখন তাঁকে (রা.) বাধ্য করা হয় তখন কয়েকবার অস্বীকৃতি জানানোর পর তিনি বাধ্য হয়ে এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং বয়আত গ্রহণ করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী (রা.)-এর এই কাজ বড়ই প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল। তিনি (রা.) যদি তখন বয়আত না নিতেন তাহলে ইসলাম এর চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো যতটা তাঁর এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধের ফলে হয়েছে। এটি হযরত মুসলে মওউদ (রা.) এই উপসংহার টেনেছেন। অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত! হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত থেকে বেরিয়ে গেছেন- এটি ভুল কথা। যেমনটি কথিত আছে যে, তারা বয়আত করেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বয়আত করেন আর পরবর্তীতে বয়আত ভঙ্গ করে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে চলে যান বা তাঁর [অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন- এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, এটি একটি ভুল দৃষ্টান্ত এবং এটি ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। এমনটি ঘটে নি। ইতিহাস এ ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের হযরত আলী (রা.)-এর যে বয়আত করেন সেটি স্বেচ্ছায় ছিল না বরং তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক বয়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। অতএব মুহাম্মদ এবং তালহা দুইজন বর্ণনাকারীর বরাতে তাবরী-তে এই রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.) যখন শহীদ হন তখন লোকজন নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, অতি সত্বর কাউকে খলীফা বানানো উচিত যেন শান্তি ফিরে আসে এবং

নৈরাজ্যের অবসান ঘটে। অবশেষে মানুষ হযরত আলীর কাছে যায় এবং তাঁকে অনুরোধ করে যে, আপনি আমাদের বয়আত নিন। হযরত আলী বলেন, যদি আমার হাতে তোমাদের বয়আত করতে হয় তাহলে সব সময় আমার আনুগত্য করতে হবে। যদি তোমরা এটি মেনে নাও তাহলে আমি তোমাদের বয়আত নিতে প্রস্তুত আছি, নতুবা তোমরা অন্য কাউকে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করে নাও, আমি সব সময় তাঁর অনুগত থাকব। আর যে-ই খলীফা হোক না কেন, তোমাদের চেয়ে বেশি তাঁর আনুগত্য করব। তারা বলে আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করছি। হযরত আলী বলেন, পুনরায় চিন্তা কর এবং নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে নাও। অতএব তারা পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের যদি হযরত আলীর কাছে বয়আত করেন তাহলে অন্য সবাই হযরত আলীর কাছে বয়আত করবে, নতুবা যতদিন তারা হযরত আলীর হাতে বয়আত না করবে ততদিন পূর্ণরুপে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। তখন হাকিম বিন জাবালাকে কয়েক ব্যক্তির সাথে হযরত যুবায়েরের কাছে এবং মালেক আশতারকে কয়েক ব্যক্তির সাথে হযরত তালহার কাছে পাঠানো হয়, যারা তরবারির ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বয়আতে সম্মত করে। অর্থাৎ তারা তরবারি উঁচিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে যে, হযরত আলীর হাতে বয়আত করলে কর, নতুবা আমরা তোমাদের এক্ষুনি হত্যা করব। অতএব তাঁরা বাধ্য হয়ে বয়আতে সম্মতি প্রকাশ করেন আর তারা ফিরে আসে। পরের দিন হযরত আলী মিম্বরে উঠেন এবং বলেন, হে লোক সকল! তোমরা গতকাল আমাকে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলে আর আমি বলেছিলাম তোমরা এ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ। তোমরা কি চিন্তা করেছ? আর তোমরা কি আমার গতকালের কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছ? যদি প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক তাহলে স্মরণ রেখো যে, তোমাদেরকে আমার পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। এতে তারা পুনরায় হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরের কাছে যায় এবং তাদেরকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে। আর রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, তারা যখন হযরত তালহার কাছে পৌঁছে এবং তাকে বয়আত করতে বলে তখন তিনি উত্তর দেন যে, "ইন্নি আন্নামা উবায়িউ কারহান" অর্থাৎ দেখ! আমি বাধ্য হয়ে বয়াত করছি, স্বানন্দে বয়াত করছি না। এভাবে লোকেরা যখন হযরত যুবায়েরের নিকট গেল এবং তাকে বয়াত করার কথা বলল, তখন তিনিও একই উত্তর দিলেন যে, "ইন্নি আন্নামা উবায়িউ কারহান" অর্থাৎ আমাকে তোমরা বলপ্রয়োগে বয়াত করাচ্ছ কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে এই বয়াত করছি না। এভাবে আব্দুর রহমান বিন জুনদুব তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করছেন, হযরত উসমানের হত্যার পর আশ্‌তার হযরত তালহার নিকট গেল এবং বয়াত করতে বলল। তিনি (রা.) বললেন, আমাকে সময় দাও। আমি দেখতে চাই যে, লোকেরা কি সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সে তাঁকে [অর্থাৎ হযরত তালহা (রা.) কে] কোনরূপ অবকাশ দিল না আর "জাআ বিহি ইয়াতুল্লুহু তাল্‌লান আনিফান" অর্থাৎ তাঁকে নির্মমভাবে মাটিতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসল যেভাবে ছাগলকে টানাহেচড়া করা হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী হযরত তালহা (রা.) পারস্পরিক মতভেদের এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়ে যান আর এরপর যখন তিনি এই বিষয়টি অনুধাবন করলেন যে, 'এতে আমারই ভুল ছিল' তখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান। এখন এই ঘটনাটি আরম্ভ হচ্ছে যে, হযরত তালহা (রা.) তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধ করতে এলেন আর বয়াত গ্রহণ করেন নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখন সেই বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করছেন। হযরত তালহা প্রথমে বাধ্য হয়ে বয়াত গ্রহণ করেন কিন্তু পরবর্তীতে সুযোগ আসলে বিরোধীতায় দণ্ডায়মান হয়েছেন এবং হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছেন কিন্তু প্রকৃত বিষয় যখন তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে, হযরত আলী (রা.)ই সঠিক; তখন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে চলে যান। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, যখন হযরত তালহা বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন

কোন এক বর্বর ব্যক্তি যে কিনা নিজেকে হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচয় দিত, পথিমধ্যে তাঁকে হত্যা করলো এবং হযরত আলী (রা.)-এর নিকট এসে পুরস্কারের প্রত্যাশী হয়ে বললো 'আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আপনার শত্রু তাল্‌হা আমার হাতে নিহত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) তাকে বলেন, আমি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি– 'তালহাকে এক জাহান্নামী হত্যা করবে'।

একই ঘটনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হাকেম বর্ণনা করেন, সওর বিন মাজযা আমাকে বলেছেন, জামালের যুদ্ধের দিন হযরত তালহার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। তখন তিনি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন দলে আছ? আমি বললাম আমি হযরত আমীরুল মু'মিনিন আলী (রা.)-এর দলের সদস্য। তখন তিনি বলেন, তোমার হাত দাও, যাতে আমি তোমার হাতে বয়াত করতে পারি। অতএব তিনি আমার হাতে ধরে বয়াত করেন এবং ইহধাম ত্যাগ করেন। আমি হযরত আলীকে (রা.) পুরো ঘটনা শুনাই। তিনি (রা.) শুনে বলেন আল্লাহু আকবার! মহানবী (সা.)-এর কথা কত সুন্দর ভাবে সত্য প্রমানিত হলো! আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, তালহা যেন আমার বয়াত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ না করেন। তিনি আশারায়ে মুবাশ্বিরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতের শুভসংবাদ দেয়া হয়েছিল। যদিও প্রথমে বাধ্য হয়ে বয়াত করেছিলেন কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি মৃত্যুর পূর্বে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে স্বস্ফুর্তভাবে বয়াত করেছিলেন। পুণ্যবান মানুষ ছিলেন আর আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত প্রদানের প্রতিশ্রুতিও ছিল। অতএব তিনি খেলাফতের বয়াতের বাইরে থাকবেন- আল্লাহ্ তা চান নি। তাই সুযোগ পেয়ে তিনি খলিফার হাতে বয়াত করেছেন। এ ঘটনা চলমান রয়েছে আগামীতেও অব্যহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আজ আমি পুনঃরায় আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়ার আহবান জানাতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিরাপদ রাখুন। আলজেরিয়ায় পরিস্থিতি কঠিনতর করে তোলা হচ্ছে। সেখানে এমন একজন সরকারী উকিল আছে, যে বারবার আহমদীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছে। একই ভাবে পাকিস্তানেও আহমদীদের সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যারা এই সংকট সৃষ্টি করছে বা যারা কোনভাবে বিরোধীতা করছে, তাদেরকে আল্লাহ্ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। পাশাপাশি যেসব আহমদী বিভিন্ন সংকট ও কঠোরতার মাঝে দিনাতিপাত করছেন, তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। পরিস্থিতি ঠিক করে দিন এবং সমস্যা দূর করে দিন। একই সাথে আমি পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষভাবে বলবো যে, দোয়ার প্রতি যতটা মনযোগ দেয়া দরকার ততটা মনোযোগ ও সচেতনতা নেই। তাই পূর্বের তুলনায় আরো বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সংকট থেকে আশু মুক্তি দিন এবং সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন; আর প্রকৃত ইসলামের বাণী আমরা স্বাধীনভাবে পাকিস্তানেও এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তে যেন প্রচার করতে পারি।

নামাজের পর আমি কয়েক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা রাবোয়া নিবাসী ডাক্তার তাহের আহমদ সাহেবের। তিনি নওয়াবশাহ জেলার প্রাক্তন আমীর শহীদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের পুত্র। গত ৪ঠা ডিসেম্বর ৬০ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তিনি সরকারী চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রথমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি মিটঠিতে বদলী নেন, যাতে ওয়াকফে জাদীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আল মেহেদী হাসপাতালে সেবাদান করতে পারেন। ডাক্তার সাহেব একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আর প্রতি রবিবার ও প্রত্যেক সন্ধ্যায়

আল মেহেদী হাসপাতালে চোখের রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ছুটির দিনে আল মেহেদী হাসপাতালে চলে আসতেন। নিয়মিত মেডিকেল ক্যাম্পে অংশ নিতেন। অনেক ক্ষেত্রে সারা দিন অপারেশনে ব্যস্ত থাকতেন। থারপারকারে শুধু আহমদী নয় বরং অআহমদীদের মাঝেও তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি সর্বজন প্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তার হার্টের বাইপাস অপারেশনও করা হয়েছিল। জীবনের শেষ বছরগুলোতো তিনি দুই তিন বার মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্তেও তিনি থারপারকার জেলায় কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি মিটঠিতে প্রায় ১৫ বছর মানবসেবায় অতিবাহিত করেছেন। তিনি গরীব দুঃখীদের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও অথিতিপরায়ন মানুষ ছিলেন। খেলাফত এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় যৌবনেই ওসীয়্যত করেছিলেন। সকল আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহউদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এবং তার বংশধরদের তার পুণ্যের পথে চলার এবং প্রতিষ্ঠিত থাকার সামর্থ দান করুন।

দ্বিতীয় জানাজা হাবিবুল্লাহ মাজহার সাহেবের। তার পিতার নাম ছিল চৌধুরী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব। হাবিবুল্লাহ মাজহার সাহেব আল্লাহ্র পথে কারাজীবনও কাটিয়েছে। তিনি গত ২৪ অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তার পিতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদী হয়েছিলেন। চৌধুরী সাহেব বিভিন্ন সরকারী বিভাগে বিভিন্ন মর্যাদায় কাজ করেছেন এবং সরকারী একটি বিভাগে পরিচালক থাকাকালীন তিনি অবসরে যান। প্রায় ৫০ বছরের বেশি কাল তিনি জামাতের সেবা করেছেন। মজলিসের কায়েদ থেকে শুরু করে আনসারুল্লাহর যয়ীমসহ বিভিন্ন জামাতী পদে এবং জামাতের প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি পদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। রসূল অবমাননা আইন-২৯৫ এর অধীনে কোন আহমদীর বিরুদ্ধে দায়ের কৃত মৃত্যদণ্ডের প্রথম মামলা হয়েছিল চৌধুরী হাবিবুল্লাহ্ মাজহার সাহেবের বিরুদ্ধে যা ১৯৯১ সালে ২৯ অক্টোবর তারিখে (লাহোরের) শাহদারা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। তাই তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রথম আহমদী ছিলেন যাকে এই আইনের অধীনে প্রথম কারাবন্দী হিসেবে কষ্ট সহ্য করার সৌভাগ্য হয়েছিল। জেলা সেশন কোর্ট তার পক্ষে রায় দিলেও বিরোধীরা হাইকোর্টে আপিল করলে আপিল বিভাগের বিচারক জাস্টিস আব্দুল মাজিদ রসুল অবমাননার নামে দায়েরকৃত মামলায় তার জামিন বাজেয়াপ্ত করেন। এবং তাকে সাজা দেয়ার জন্য তখন যত চেষ্টা করা সম্ভব ছিল, বিরোধীরা তা করেছে। ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় লিফলেট বিতরণ করে এবং তার সম্পর্কে বাজে কথাবার্তা তারা প্রচার করে। যাহোক চৌধুরী হাবীবুল্লাহ সাহেব এই সময়ে অত্যন্ত সাহসীকতা ও বীরত্বের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে বন্দী জীবনের কাঠিন্য সহ্য করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানদেরকে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত মিশুক, সমব্যাথী, বিনয়ী, খেলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগী ও খেলাফতের নিষ্টাবান প্রেমিক ছিলেন। জুমুআর খুৎবা ও বক্তৃতা নিয়মিত শুনতেন বরং ঘরের সবাইকে একত্রিত করে একথা বলতেন যে, সকল কাজ রেখে দাও এবং এখানে বসে খুতবার সময়ে খুতবা শুন এবং স্বয়ং উপস্থিত থেকে সবাইকে খুতবা শোনাতেন। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে তিনি মুসী ছিলেন এবং ১/৯ ভাগ ওসীয়্যত করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তার সহধর্মিণী রুকাইয়্যা বেগম ছাড়াও পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তার এক ছেলে হাসিব আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ এবং ফযলে উমর ফাউন্ডেশনে ইংরেজী বিভাগে কাজ করছেন। আল্লাহ তা'লা

মরহুমের সঙ্গে কৃপা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকেও তার সৎকর্মের ধারা অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

পরবর্তী জানাযা জনাব বশিরুদ্দীন আহমদ সাহেবের। খলিফা বশিরুদ্দীন আহমদ গত ৩০ নভেম্বর ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । ভারতের ফিরোজপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খলিফা তাক্বিউদ্দীন সাহেবের পুত্র এবং হযরত ডাক্তার খলিফা রশিদ উদ্দীন সাহেবের পৌত্র ছিলেন। ডাক্তার খলিফা রশিদ উদ্দীন সাহেব খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর প্রথম সহধর্মিণী উম্মে নাসেরের পিতা ছিলেন। হযরত খলীফা রশিদুদ্দীন সাহেবের মালী কুরবানীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যাইহোক তিনি তার বংশধর ছিলেন। জামাতী কাজেও অংশ নিতেন। অ-আহমদীদেরকে নিজ ঘরে ডেকে তবলীগ করতেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছেন। ১৯৯৮ সনে সুইডেন চলে যান । ১৯৯৯ সনে সেখানে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপর তিনি সুস্থ হয়ে পুনঃরায় মসজিদের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। সেক্রেটারী তবলীগও ছিলেন । প্রতিবছর স্বীয় স্ত্রী সন্তানদের সাথে এখানে অর্থাৎ ইউকে'র জলসায় যোগদান করতেন। তিনি তার স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। তার স্ত্রী একজন ইংরেজ ছিলেন যিনি খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে আহমদী হয়েছিলেন কিন্তু খুব শালীন পোষাক পরতেন এবং পর্দা করতেন। খুবই সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। তার ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের খুব আগ্রহ রয়েছে এবং সেগুলোর ওপর আমল করারও পূর্ণ চেষ্টা করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ঈমান ও বিশ্বাসেও উন্নতি দান করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পূণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফীক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি কৃপা ও দয়ার আচরন করুন।

পরবর্তী জানাযা মোহতরমা আমিনা আহমদ সাহেবার যিনি খলীফা রফিউদ্দীন আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । তিনি গায়ানার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯৪০ সনে গায়ানার বিখ্যাত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার শিক্ষাজীবনে লন্ডনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তখনই তার বিবাহ আর ডি আহমদ সাহেব মরহুমের সাথে হয় যিনি ডাক্তার খলিফা তকিউদ্দিনের সন্তান ছিলেন। তিনি হযরত খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেবের বংশধর ছিলেন। মরহুমা খুবই সহানুভুতিশীলা, লোকদের দেখাশুনাকারী ও অতিথিপরায়ন নারী ছিলেন। নামাযে নিয়মিত ছিলেন। সর্বদা তার নামাযের চিন্তা থাকত। শরীর ভাল না থাকা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। শারিরিক অসুস্থতা ও ক্যান্সার থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যের প্রায় প্রতিটি জলসায় শরিক হতেন। দোয়ার ওপর খুব জোর ছিল। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। সর্বদা যখনই আমার সাথে সাক্ষাত করতেন বিশেষভাবে খুব বিনয়ের সাথে সাক্ষাত করতেন। দোয়ার অনুরোধ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাসুন্দর ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদেরও জামাতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফীক দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)